সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের
৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার
প্রতিবেদন ২ পাতায়

কলকাতা ২৮ পৌষ ১৪২২ ● বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ ● ২ টাকা

তবু অপেক্ষায় আছি

প্রচেত গুপ্ত

আধুনিক জীবন যেমন অনেক কিছু দিচ্ছে, কেড়েও নিচ্ছে অনেক। পুরোনো ধ্যানধারণার কথা শুনলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাসি পেত, এখন অবাক লাগে। সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, বিরহ, মূল্যবোধের সংজ্ঞা পালটে যাচ্ছে রোজ। কীসে সুখ আর কীসে দুঃখ এখন চট করে বলা যাবে না। কোনটা মূল্যবোধ, কোনটা নয় -- বোঝা কঠিন। আগে বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাটা ছিল কর্তব্য। এখন বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাটা আদালতের আদেশ। আগে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েকে আগলে রাখলে খুশি, এখন দূর দেশে পাঠাতে পারলে গর্বিত। আমাদের চাওয়ার সীমানা যেমন বেড়েছে, না চাওয়ার ঝুলিটি যাচ্ছে বোঝাই হয়ে। আমরা গাড়ি বাড়ি চাই। আকাশ, নদী, জঙ্গল চাই না। আগে আমার তিন 'মান'-এর দাপটে কুঁকড়ে থাকতাম। মান, অভিমান, সম্মান। এখন তিন ভিলেনই উধাও। কাজের জায়গায় গাল খেলে আগে বলতাম অপমান, এখন বলি জব হ্যাজারডস্। বাড়িতে ঝগড়া হলে হত অভিমান, এখন বলি ফালতু। কেনা বেচার খেলায় ঢুকে সম্মান নিয়ে ভাবি না মোটে। শুধু বেচছি আর কিনছি। ভালবাসা, বিরহ, মিলন, বিচ্ছেদও কেনা বেচা করছি। করে কেউ বাঁচছি, কেউ মরছি।

নিশ্চয় মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয় সেই লোক যে মনে করে, আগের সবটাই ভাল ছিল, এখন সব খারাপ। আগে দুধ ছিল খাটি, আকাশ ছিল নীল, গাছ ছিল সবুজ। এখন দুধ জোলো, আকাশ ঘোলাটে, গাছ ফ্যাকাসে। না, আমি এই দলে পড়ি না। এখন অনেক কিছুই ভাল। আগের তুলনায় বেশি ভাল। প্রযুক্তি আরও উন্নত, বিজ্ঞান আরও এগোচ্ছে, সমাজে কোনওরকম অন্যায় দেখলে তরুণ সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে। সংবাদ মাধ্যমের জন্য চাপে থাকছে সরকার। বিরোধীরা জনতার প্রত্যাখানে সমঝে চলছে। অসহায় বৃদ্ধ, নারী, শিশুর জন্য আইন হচ্ছে কড়া। নারীর সম্মান, অধিকার মানুষ আজ অনেক বেশি সচেতন। পুরোনো মূল্যবোধের যেমন ক্ষয় হয়েছে, তেমন নতুন মূল্যবোধ তৈরিও হয়েছে। নইলে এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত রুখে দাঁড়ানো হতে পারে না।

তবে হারিয়েছি এবং হারাচ্ছি কম কিছু নয়।

তখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি। থাকতাম কলকাতার গায়ে। প্রপার কলকাতা যাওয়ার জন্য দুটো মাত্র বাস রুট। তাও বাস কখন পাওয়া যাবে ঠিক নেই। ট্যাক্সি যেতে চাইত না। সেখানে তখন বড় বাড়ি ছিল না, অনেক মাঠ আর পুকুর ছিল। গাছ ছিল অনেক। এমন কোনও বালক বালিকা ছিল না যারা বিকেলে খেলত না। শীতের মুখে সন্ধ্যে হলেই উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে কুয়াশা মিশে তৈরি হত ধোঁয়াশা। ল্যাম্পপোস্টের মলিন আলো। ইঁটের রাস্তা। দিনগুলো যেমন রোদ ঝলমলে, রাত তেমনই গা ছমছমে। আমার বাবা সপ্তাহে একদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যেতেন। সম্ভবত বুধবার। ফিরতে ফিরতে রাত। মনে পড়ে, রাত বাড়লেই ছটফট করতাম। বাবা এখন কোথায়? বাবা কখন ফিরবে? ট্রেন কি লেট? নাকি গোলমাল? বার বার ঘর আর বারান্দা করতাম। পড়া ফেলে উঠে যেতাম। আমার মা ছিলেন অধ্যাপিকা। তিনি সপ্তাহে একদিন করে গোর্কিসদনে রুশ ভাষা শিখতে যেতেন। সন্ধ্যের পর ক্লাস। ঝড় বৃষ্টির সময় ফিরতে রাত হত। আমরা মুখ শুকিয়ে অপেক্ষা করতাম। মা কোথায়? এতো গেল বাবা-মায়ের জন্য অপেক্ষা। ছেলে-মেয়েদের জন্য বাবা-মায়েরা অপেক্ষা করত গলির মোড়ে। কখনও রাগে, কখনও চিন্তায়। কোনও কোনও ছুটির দিন প্রিয় আত্মীয়স্বজন

এরপর ৩ পাতায়

অঙ্কন: মোহনলাল মুখার্জি

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১৭ জানুয়ারি, ২০১৬

সাধারণ সম্পাদক গৌতম সাহার প্রতিবেদন

শ্রদ্ধেয় শুভানুধ্যায়ী ও সঙ্ঘের সদস্যগণ:

সঙ্ঘের ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বর্তমান কার্য্যকরী সমিতির সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সর্বস্তরের মানুষের পরামর্শ ও দান এবং সংঘের সদস্যদের আন্তরিক প্রয়াস ও পরিশ্রমে গত এক বছরে সংঘ বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে সামর্থ হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ৭০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসকে যা সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আনন্দের বিষয়, নানা প্রতিকুল পরিবেশ, লোকবল ও অর্থের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধী সেবা সংঘের সেবামূলক কাজের পরিধি ও সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিতি ক্রমেই বাড়ছে।

গত এক বছরে সংঘ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে চিরতরে হারিয়েছে। শ্রীমতি মায়া রায় এবং সম্প্রতি শ্রীমতি দীপ্তি ব্যানার্জী পরিণত বয়সে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। এই দুজনাই একসময় সংঘের পরিচালন সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও একনিষ্ঠ সদস্যা ছিলেন এবং বহু বছর ধরে সংঘের তথা সমাজের উন্নতি কল্পে নিরলস পরিশ্রম করেছেন।বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণের আগে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছি। এছাড়াও, গত এক বছরে সংঘের অনেক সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা অনেক নিকটজনকে চিরতরে হারিয়েছেন। এঁদের পরিবারের সদস্যগণকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই এক বছরে দেশ ও বিদেশের বেশ কয়েকজন জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দেশনায়ককে আমরা হারিয়েছি। এছাড়াও, এই সময়ের মধ্যে ভুকম্প সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, ঘোষিত ও অঘোষিত যুদ্ধ, আতঙ্কবাদীদের নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসলীলায় শিশু সহ বহু নিরীহ মানুষের অকালে প্রাণ গিয়েছে। অত্যন্ত ব্যথিত ও আশঙ্কিত চিত্তে আমরা সেই সব জানা অজানা মানুষদের স্মরণ করছি।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ও ঘটনা -

১) ২৪শে মে ২০১৫, গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল এর বহির্বিভাগের উদ্বোধন।

২) ১৬ই আগস্ট ২০১৫, ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসাকালীন আশ্রয় 'সেবা নিবাস'-এর এগারোটি নতুন ঘরের সংযোজন।

৩) সংঘের সাহায্যকারী, ফ্রান্সের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'প্ল্যানেট ক্যুয়র' এর পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য ডঃ পিয়ের ভেরউস্ট এর গান্ধী সেবা সংঘ পরিদর্শন।

বিভিন্ন বিভাগের কাজের বিবরণ:-

১) দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ-

আলোপ্যাথি - রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া সারা বছর সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত দুইজন সেবামনস্ক অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ডাঃ শ্রীমতি ঝর্না পালচৌধুরী ও ডাঃ শ্রীমতি জয়ন্তী পোদ্দার, বহু দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা করেছেন। প্রয়োজনীয় ওষুধও দেওয়া হয়েছে। রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বহু বছর ধরে সিডিএমএইচইউ নামক সেবামূলক সংস্থা থেকে ওষুধ কেনা হচ্ছে। মাসে প্রায় চার হাজার টাকার ওসুধ কেনা হয়। এছাড়া, বেশ কিছু ওষুধ বিভিন্ন চিকিৎসক ও জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে শিশু রোগ বিশেষ' ডাঃ সুভাষ রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তাঁকে ধন্যবাদ।

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় রোগীদের টিকিট (তিন দিনের ওষুধ সহ) দশ টাকা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি টাকা করা হয়েছে। তবে, অবস্থা বিচার করে দুঃস্থ রোগী ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে।২০১৫ জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৩৫৪০ জন রোগী এই কেন্দ্রে চিকিৎসিত হয়েছেন।

হোমিওপ্যাথি- এই বিভাগে ডাঃ এস, এম, চক্রবর্তী বিগত বহু বছর ধরে সপ্তাহে তিন দিন বিকালে রোগী দেখছেন। গত বছর এই কেন্দ্রে রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে ৬০ জন। এপ্রিল থেকে মার্চ, এক বছরে মোট রোগীর সংখ্যা ৯১৯১।

চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ- পূর্ব কলিকাতা নাগরিক পরিষদ ট্রাস্টের সক্রিয় সহযোগিতায় ও আর্থিক সহায়তায় প্রতি সোমবার সকালে গড়ে ২৫ জন রোগী মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। বিনা মূল্যে চশমা ও প্রয়োজনে বিনা খরচে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ২৫ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে।

এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে চক্ষু পরীক্ষা আগের মতই চলছে।

ইসিজি - ইসিজি মেশিনটি বহু খরচায় ভালো ভাবে সারানো হয়েছে। খরচ বৃদ্ধির জন্য ইসিজি-র চার্জ ষাট টাকা করা হয়েছে। এ বছর রোগীর সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি।

স্বাস্থ্য পরিষেবা উপসমিতির আহ্বায়িকা শ্রীমতি জবা গুহঠাকুরতা।

২) ক্যানসার বিভাগ - সেবা নিবাস

এই বিভাগের অন্যতম কাজ দূরদূরান্ত থেকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসা ক্যানসার রোগী ও তাদের সাথীদের জন্য থাকবার ব্যাবস্থা করা। ২০০৫ সালে এই উদ্দেশ্যে ৪টি ঘর তৈরী করে যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে আরও ৮টি ঘর ও একটি বড় রান্নাঘর নির্মাণ করা সম্ভব হয়। এ বছর সংঘের তিনতলায় নতুন ১১টি ঘর, কয়েকটি শৌচাগার ও স্নানাগার সংযোজিত হয়েছে। গত ১৬ই আগস্ট স্থানীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বোস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও বহু গণ্যমান্য অতিথিদের এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে এই নতুন নির্মিত অংশের উদ্বোধন করেছেন প্রখ্যাত ক্যানসার চিকিৎসক ও চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঐ

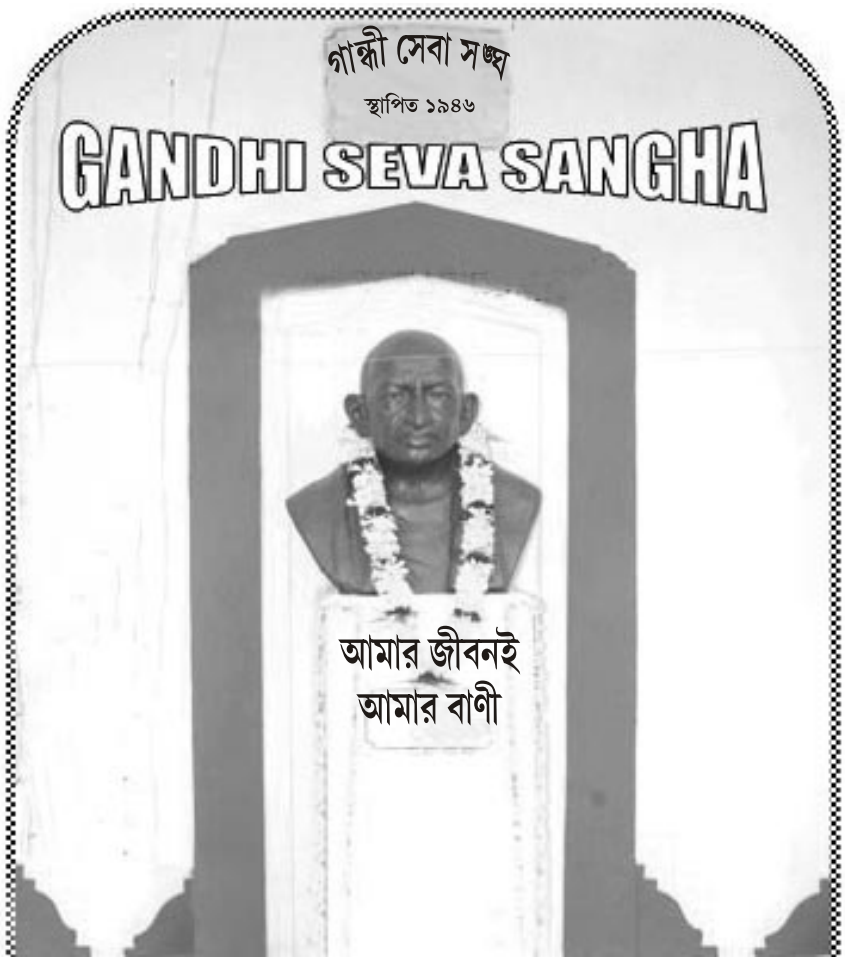

প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগের প্রধান ডঃ সুধীন ভট্টাচার্য। নতুন এই অংশটির নির্মাণ, আলো-পাখা ও আসবাবপত্রের জন্য প্রায় এগারো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং এর পুরোটাই সংগ্রহ হয়েছে শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ও দানে। এক লক্ষ টাকা বা তার বেশী দান করায় তিনটি ঘর যথাক্রমে শ্রী তাপস প্রামাণিক ও শ্রীমতি লীলা প্রামাণিক, শ্রীমতি হৈমন্তী দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতি জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এছাড়া, বিশেষ উল্লেখযোগ্য দাতাদের নাম - শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শ্রী পি, চক্রবর্তি, প্ল্যানেট ক্যুয়ার, যোশী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, শ্রী প্রণব কুমার দত্ত, শ্রী শংকরলাল ঘোষাল, শ্রী অমর নাথ রায় সহ মোট পনেরোজন দাতা যাহাদের নাম শ্বেত পাথরে লেখা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ঘরগুলির জন্য শ্রী উৎপল ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত শ্রমদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নতুন ঘরগুলিকে নিয়ে এখন সেবা নিবাসের মোট ঘরের সংখ্যা হ'ল ২৫টি।

ক্যানসার রোগীদের সমস্যার শেষ নেই। বিশেষতঃ, বহু ক্ষেত্রেই এই আবাসে থাকাকালীন অনেক দুঃস্থ রোগী বা তাদের পরিবারের সদস্যরা ওষুধপথ্য কেনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারে আর্থিক ও অন্যান্য গভীর সমস্যায় পড়েন। কিছুটা হলেও তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য একটি 'দুঃস্থ ক্যানসার রোগী সহায়তা তহবিল'শুরু করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীমতি ডঃ রেখা রায়চৌধুরী প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা এই তহবিলে দান করছেন। এই তহবিল থেকে চিকিৎসার ব্যাপারে কয়েকজন রোগীকে সহায়তা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, প্রিয়জনের জন্মদিন বা মৃত্যু তিথি বা অন্যান্য উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকজন রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি ইত্যাদি বা অন্যন্য জিনিসপত্র বিতরণ করেছেন। সল্টলেকের একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার (TCS) তরুণ তরুণীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ক্যানসার বিভাগের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রী সমীর নন্দী ও শ্রী অনিরুদ্ধ ঘোষ।

৩) গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল প্রকল্প

গান্ধী সেবা সংঘের ইতিহাসে সবথেকে বড়, এই ১০০ শয্যা, ICU, Dialysis ও ৫টি আধুনিক Operation Theater সহ গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল প্রকল্প যেটির আনুমানিক প্রকল্প খরচ প্রায় ১৩ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২রা অক্টোবর ২০১৫। কিন্তু, নানা কারন ও প্রতিবন্ধকতায় সময়মত কাজ শেষ করা যায়নি।

তবে, আনন্দের কথা, পরিকল্পনা মত ১লা জুন ২০১৫ থেকে সংঘের নিজস্ব ভবন থেকেই হাসপাতালের একটি ছোট বর্হিবিভাগ শুরু করা হয়েছে। এজন্য, পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রী শম্ভু বণিকের তত্ত্বাবধানে সংঘের একতলায় একটি ঘরকে আমূল সংস্কার করে এয়ার-কন্ডিশন্ড দুটি ডক্টরস চেম্বার, রিসেপশন ও রোগীদের বসার জায়গা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চক্ষুরোগ পরীক্ষার জন্য সোয়া দুই লাখ টাকা দিয়ে একটি সর্বাধুনিক Refractometer কেনা হয়েছে। ২৪শে মে একটি নজরকাড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সাংসদ মাননীয়া শ্রীমতি (ডাঃ) কাকলী ঘোষদস্তিদার। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ সুদর্শন ঘোষদস্তিদার। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য পরিবেশ পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত নদী বিষেশজ্ঞ ডঃ কল্যাণ রুদ্র। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল প্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা ও চেয়ারম্যান, স্থানীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বোস। এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন Blood Test, ECG সহ বেশ কিছু পরীক্ষা বিনাখরচে করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ চারশোর বেশী স্থানীয় মানুষ এই অনুষ্ঠান ও মেডিক্যাল ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন।

এখন রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১টা ও বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৩০ জন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ১০০, ১৫০ ও ২০০ টাকার বিনিময়ে রোগী দেখছেন। ৮০ টাকায় ইসিজি করা হচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় দুটি প্রতিষ্ঠিত ডাইগ্নোস্টিক সেন্টারে Unimed Diagnostics ও Apollo Clinics, Jessore Road, এ পরীক্ষায় ২৫-৩০% ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এটির প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের জন্য কম খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, সেবা মনস্ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি গ্রুপ তৈরী করা ও হাসপাতাল সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো। এই কেন্দ্র চালানোর জন্য দুইজনকে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে, কিছুটা আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে এখনো রোগীর সংখ্যা আশানরূপ হয়নি। তবে, প্রচারের ফলে রোগীর সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। এখন মাসে প্রায় তিনশো রোগী এই সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

হাসপাতালের ছ'তলা মূল বিল্ডিংএর বেশিরভাগ Civil work শেষের মুখে। স্থির হয়েছে, যত

এরপর ৭ পাঁতায়

প্রজাতন্ত্র ভারত ও নারী প্রগতি

বরুন দেব ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'মনু বলেছেন, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষা-নীয়াতিযত্নতঃ -- ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।' স্বামীজি এই চিঠিটি লেখার পর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে এখনও আমরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারিনি। ভারতীয় সমাজের তিন-চতুর্থাংশ এখনও নিরক্ষর।

তবে ৬৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ আয়োজন একেবারেই যে হয়নি এমনও নয়। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমতি দুর্গাবাঈ দেশমুখকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করেন। এদেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে যথাযথ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যাস্ত হয়। দুর্গাবাঈ কমিটি কতকগুলি পরামর্শ দিলেন, যেমন, ১) স্ত্রীশিক্ষা যে সমস্ত দেশের এক বিশেষ সমস্যা তা দেশকে মেনে নিতে হবে। ২) স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্তরে উপযুক্ত সংগঠন বা পর্ষদ স্থাপন করতে হবে। এবং ৩) কেন্দ্রে ও রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ বিভাগ রাখতে হবে। এরপর ১৯৮৬ সালের ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে ১৭ দফা শিক্ষাসূচি গ্রহণ করলেন তার অন্যতম ছিল ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার স্বীকৃতি। এছাড়া স্বাধীন ভারতে National Council for Women's Education নামক যে সংস্থাটি গড়ে উঠল তার কাজ দাঁড়াল স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে নিযুক্ত সরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতেই হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের যতই প্রচেষ্টা থাক স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও আমাদের দেশ দারুণভাবে পিছিয়ে। এর পিছনে কতকগুলি কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমত, এদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা, মেয়েদের কাজ ঘর-গেরস্থালী করা এবং সন্তান লালনপালন করা, লেখাপড়ার কাজটা পণ্ডশ্রম মাত্র। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতার দ্বিতীয় কারণ, লেখাপড়ার জগতে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের অবাঞ্ছিত মনে করেন। অনেক মেয়েরই এখনও ধারণা (বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে) লেখাপড়া শিখলে তারা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবেন এবং এটা এক ধরনের অপরাধ।

স্ত্রীশিক্ষায় আমাদের পিছিয়ে পড়ার তৃতীয় কারণ, আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। শোচনীয় আর্থিক অনটনের কবলে পড়ে অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও লেখাপড়া করতে পারে না। অবশ্য সরকারি অব্যাবস্থা এবং শিক্ষা বিস্তারে সাংগঠনিক ত্রুটিও অনেক সময়ে প্রতিবন্ধক হয়। বহু সময় দেখা যায় যে, বিদ্যালয় আছে শিক্ষক নেই, আবার কখনও দেখা যায় যে, শিক্ষক আছেন তো বিদ্যার্থী নেই। অনেক সময়ে আবার বইয়ের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ থাকে। সরকারি বিধি-ব্যবস্থা ঠিক সময় ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় না। স্ত্রীশিক্ষার চতুর্থ নম্বর শত্রু হল রাজনৈতিক কোলাহলকে ঘিরে সামাজিক অস্থিরতা। প্রজাতন্ত্রর ভারতে এই সকল সমস্যাগুলি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বলে আমার মনে হয়। আবার এটাও মনে হয় যে, শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে এর প্রতিবিধান হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীশিক্ষার এই বৃহত্তর দিকটি সম্বন্ধে দেশ ও জাতিকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীন শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তন কর। জমানো দুধ দিয়ে বিভিন্ন খাবার কিভাবে প্রস্তুত করা যায়, মেয়েদের সেসব শেখাও। শৌখিন রান্নাবান্না, সেলাই-এর কাজ শেখাও। তারা ছবি আঁকা, ফটোর কাজ, কাগজ কেটে বিভিন্ন রকম জিনিস তৈরি করা, সোনা-রুপোর ওপর সুন্দর সুন্দর কাজ করা, ইত্যাদি শিখুক। লক্ষ্য রাখো তারা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে।' এই যে মেয়েদের ব্যবহারিক শিক্ষা, এর ওপর কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সম্পর্কে 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার ওপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী?'

আজকাল নারী প্রগতির কথা অনেকের মুখেই শোনা যায়। বিদ্রোহের ঝোঁকে বহু মেয়েই বলে থাকেন, 'মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান'। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষীই এ ধরনের উক্তিকে সমর্থন করেননি। তাঁরা মনে করেন, ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে, আর পুরুষদের স্বভাবে বেশি আছে শক্তির অংশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে উভয়ের স্বভাবের ওই বিশিষ্টতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রগতিবাদী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে প্রায়ই বলে থাকেন, "মেয়েরা পুরুষের দাসত্ব করছে। শুধুমাত্র গায়ের জোরেই পুরুষ মেয়েদের কাঁধের ওপর আনুগত্যের বোঝা চাপিয়েছে"। 'বিদ্রোহী' মেয়েদের এধরনের যুক্তিকেও অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, "স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়ানয়। প্রেম আছে বলেই স্ত্রীস্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নেই। তাদের মতে স্নেহ আছে বলেই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নেই"।

সবদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, জ্ঞানের রাজ্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা না টানাই ভালো। যা কিছু জানবার যোগ্য, তাই বিদ্যা নামে অভিহিত। তা জানবার অধিকার পুরুষের যেমন নারীরও তেমনই আছে। নারীর জানার আগ্রহকে যদি মর্যাদা না দেওয়া হয় তো তার প্রকৃতি দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে স্ত্রীশুক্ষার পথকে অবরুদ্ধ করে আমরা যেন এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিই। আবার একাথাও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা ছাড়া প্রগতির কোনো স্থান নেই। কারন প্রগতি কথাটির অর্তই হল জ্ঞান ও কর্মে অগ্রগতি। শিক্ষা এই অগ্রগতিকে প্রশস্ত ও তরান্বিত করে। এ যুগে বহু উন্নত দেশের নারীরা যে আমাদের নারীদের তুলনায় প্রগতিশীল, শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে তারা যে আমাদের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে, তার প্রধানতম কারন মনে হয় যে, স্ত্রীশিক্ষায় তাঁরা যথেষ্ট যত্নবান। অবশ্য 'প্রগতি' কথাটিরও অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা হয়। অনেকেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাড়াবাড়িকে পোশাক-আশাকে অশোভন চাকচিক্যকে এবং আচার-আচরণে প্রগলভতাকে প্রগতির লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেন। এদের কোনোটাই প্রগতি নয়। যেখানে উন্নতি নেই বিকৃতি আছে, সেখানে কখনোই প্রগতি থাকতে পারে না। যে জিনিস পচা, দুষিত তার মধ্যে দিয়ে অগ্রগতি হবে কী করে?

অবশ্য একথাও ঠিক যে প্রগতির দোহাই দিয়ে, নারীস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আমাদের দেশেও অনেক নারী বহু অন্যায়, অসাধুতা ও অশালীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বিদেশে নারী প্রগতির নামে যে যথাচ্ছাচার চলছে, বহু ক্ষেত্রেই তাও কারও অবিদিত নেই। মূল শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ অতিস্বাধীনতা ও আধুনিকতা এবং সামাজিক কিছু মুল্যবোধের অভাব এজন্য হয়তো দায়ী। কিন্তু এর প্রতিকার করতে গিয়ে কেউ যদি স্ত্রীশিক্ষাকে খর্ব করতে উদ্যত হন তো কাজটা হবে মাতলামোর জন্য তালগাছ উচ্ছেদ বা আঙুর ফল নষ্ট করার সামিল। আসলে যা দরকার তা হল এমন শিক্ষাব্যাবস্থা চালু করা যা আমাদের বিষয় বুদ্ধিরই শুধু নয়, বিবেক বোধেরও উজ্জীবনে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা যেমন সার্থক হবে, নারী প্রগতিও তেমনি তার প্রকৃত পথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না। প্রজাতন্ত্র ভারতে সকল স্বাধীন-চেতা নারীদের কাছ থেকে এটাই আমাদের কাম্য।

তবু অপেক্ষায় আছি

১ পাতার পর

আসার কথা হলে ছাদ থেকে উঁকি দিতাম।

কখন আসবে? কখন আসবে এই অপেক্ষার বাইরেটা যতই উদ্বেগের থাকুক, ভিতরটা ছিল শুধুই ভালবাসার।

মোবাইলের যুগে এই সব 'অপেক্ষা'রা পালিয়েছে, এখন অপেক্ষা শুধু সেই মানুষের, যে মানুষের মতো মানুষ। যে শুধু নিজের আর নিজের পরিবারের কথা ভাবে না। চেনা বৃত্তের বাইরের মানুষকে নিয়েও যার ভাবনা। সেই মানুষের জন্য করি অপেক্ষা যে জানে নিজে একা ভাল থাকা যায় না। ভাল থাকতে হয় সকলকে ভাল রেখে।

এমন মানুষের জন্য অপেক্ষা করেও আনন্দ।

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
Leader in Solar PV Engineering
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

সংঘ সংবাদ

দূর্গা পুজোর পরে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বিজয়া সম্মেলনী পালিত হয় মাণিক্য মঞ্চে। পরিচিত বন্ধুরা, অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, Inner Wheel-এর সদস্যরা সকলেই আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেন। গান, নাচ, আবৃত্তি এবং পত্রিকা 'সেবক'-কে ঘিরে একটি গঠনমূলক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন সেবকের লেখক-লেখিকারা। পরিশেষে মিষ্টি সহযোগে ওই সন্ধ্যা বেশ মনোরম হয়ে উঠেছিল।

এরপরে EKCO, আত্মবিকাশ -- এসব সংস্থার বিজয়া সম্মিলনীও পালিত হয় সমারোহের সঙ্গে।

''পুনশ্চ'' সংস্থার রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয় মাণিক্য মঞ্চে।

জানুয়ারি মাসে ''উপাসনা'' সংস্থার আয়োজিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মাণিক্য মঞ্চে।

৭, ৮, ৯ এবং ১০ জানুয়ারি ধারাবাহিকভাবে নাট্যোৎসব পালিত হয় EKCO সংস্থার প্রযোজনায়। প্রতিদিন দুটি করে নাটকের উপস্থাপনায় অঞ্চলের মানুষেরা অত্যন্ত আপ্লুত। সারা বছর ধরে এখানকার দর্শকরা অপেক্ষা করেন এই নাট্যোৎসবের জন্য।

১৭ই জানুয়ারি গান্ধী সেবা সংঘের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চাশজন সদস্য এবং অতিথি উপস্থিত ছিলেন। নানা বিষয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা নিবাসের সম্প্রসারণের জন্য যাঁরা যাঁরা অর্থ সাহায্য করলেন:

১) শ্রীমতি শাশ্বতি বসু ৩০,০০০ টাকা

২) মেঘা মজুমদার ৩০,০০০ টাকা

সেবা নিবাসের Poor Relief Fund-এ শ্রীমতি রেখা রায়চৌধুরি নিয়মিত অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন যথাক্রমে প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা করে। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমেরিকা নিবাসী তিন বন্ধু James McGuire, Paul Wareke এবং Jamie Christy ৩০০০ টাকা দান করেছেন।

আভেরী গুহঠাকুরতা নিজের জন্মদিন উপলক্ষে ক্যান্সার রোগীদের ফল মিষ্টির জন্য ১০০০ টাকা দিয়েছেন।

সেবক
২৮ পৌষ ১৪২২ ● বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারি ২০১৬

সব মরণ তো নয় সমান

বৈষম্যকে ভিত্তি করে ভেদাভেদটা কখনও ধনী-দরিদ্র, কখনও গ্রাম-শহর বিস্তীর্ণ প্রসারিত। আজও। কারণটা যে কত গভীরে, কত নিগূঢ়, কতটা সত্য তা এই প্রজাতন্ত্রের প্রস্তুতি পর্বের আগেই বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবি হাতে হায়দরাবাদের হস্টেল থেকে বিতাড়িত, অপমানিত, অবহেলিত, শীতের খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো রোহিত ভেমুলার আত্মহননে আবারও দেশবাসীর হৃদয়ে প্রশ্ন রেখে গেল। সব মরণ তো নয় সমান। অবহেলা, অস্পৃশ্যতা, নৃশংসতা তখনই, যখন তা শত্তুরে করে। ভাবনায়, চেতনায়, মননে, সৃজনে রোহিত বিজ্ঞান লেখক কার্ল সাগান-এর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত। সদ্য প্রজাতন্ত্রের 'প্রজারা' আম্বেদকরের 'Annihilation of Caste'-এর উপলব্ধিতে উপলব্ধ না হওয়াটাতেই কি এমন ব্যাথা? এই ভেদাভেদির ঊর্ধ্বে ওঠার লড়াই থেকে, নিছকই 'জেনোফোবিয়া'-র আবরণ খসিয়ে পত্রিকা 'সেবক' অবিরল অবহেলিত, ন্যায়সঙ্গত 'সংগ্রামী' সেবায় নিযুক্ত থাকবেই।

দেশ প্রেমিক

শঙ্করলাল ঘোষাল

পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নিজের দেশকে ভালোবাসে না। স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আস্থা কোনও মানুষের আচরণে যদি এই গুণগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয় -- তাকে অবশ্যই একজন দেশভক্ত বলা যেতে পারে। পরদেশীর মুখে স্বদেশের নিন্দা কোনও দেশপ্রেমিকই সহ্য করতে পারে না। অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতে আগ্রহী হন। অনেক সময়ই দেখা যায় বহু মানুষ নিজের রুজি-রোজগারের জন্য স্বদেশ থেকে সুদূর প্রবাসে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন -- কিন্তু মনটি পড়ে আছে নিজেদের সেই অতি প্রিয় দেশের দিকে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া খুব সহজ, কাজ করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ইচ্ছা বা প্রবল মানসিক দৃঢ়তার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। অনেকে মনে করেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হলেই বুঝি প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া যায়, সত্যি কি তাই? অভিজ্ঞতা বলে নানা সভা-সমিতি, বক্তৃতা, মিটিং, মিছিল, ক্ষোভ-বিক্ষোভ করলেই প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। ত্যাগের ইচ্ছা থাকতেই হবে।

একজন আদর্শবান দেশপ্রেমিক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে কোনও দিন অংশগ্রহণ করেননি অথচ তাঁর ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে উৎসাহিত হয়ে সমকালীন কত যুবক-যুবতী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। আমাদের দেশের আরও একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক নেতাজি। উনি স্বামীজির একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন। স্বামীজির শিষ্যা ভগিণী নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন নিজের দেশের মতই। বিদেশে গিয়ে বহু সভা-সমিতিতে স্বামীজি বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রাচ্যের যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আছে এবং সরল, সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে যে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সেবার মনোবৃত্তি আছে বার বার তা তুলে ধরেছেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত স্বদেশের সুগুণ ও দুর্গুণ, সুবিধে বা অসুবিধের সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ স্বামীজি করে গেছেন। আজ এতদিন পরেও তা বড়ই প্রাসঙ্গিক। তাঁর দেখানো ও শেখানো পথে আমরা যদি আংশিকভাবেও কিছুটা এগোতে পারি -- তাহলে দেশে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
আয়োজনে
আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান
ও
২৭শে মার্চ, রবিবার, বিশ্ব নাট্যদিবসের
একদিনের নাট্যোৎসবে
লেক টাউন মুক্তমঞ্চে
সকলের আমন্ত্রণ
নাটক দেখুন
নাটক করুন
লেকটাউন মুক্তমঞ্চে ধারাবাহিক নাট্যপ্রদর্শন
প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ
সবার আমন্ত্রণ
নির্মল শিকদার- ৯৮৩০০৪৯৭৩৮

অরণ্যের প্রজাতন্ত্র

প্রতিভা সরকার

ইন্দ্রাণী আমার থেকে ছোট। আমার সহকর্মী। গৃহিণী এবং মা। বাড়িতে কোন 'কাজের লোক' নেই। আছে একটা দুর্দান্ত শাখ। ফটোগ্রাফি, বন্য প্রাণীর, বিশেষ করে পাখপাখালির। সেই টানে সে বেরিয়ে পড়ে, কখনও একাই। এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্য, এক নদীর পর আর এক নদী। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় দীর্ঘদেহী এই বন্ধুটি আমায় ফিরে এসে অনেক ছবি দেখায়। কোথায় নদীর চরে উড়ে যাচ্ছে অসংখ্য লালমাথা হাঁসের দল, কখনও দূর পাহাড়ের চূড়ো ছুঁয়ে সূর্য-ওঠা। সে সব ছবি দেখলে মনে হয় সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। গর্ব হয় এত শ্রীময়ী মাটিতে মিশে যাওয়া আমার ভবিতব্য বলে।

ইন্দ্রাণীর মত মেয়েরা সংখ্যায় বেড়েই চলেছে। ঘর সংসার কাজের জায়গা সব সামলে ক্রমাগত তারা বাড়িয়ে নিচ্ছে নিজেদের জীবনের

পরিসর। আসন্ন ২৬শে জানুয়ারিতে এবং পরেও এদের কথা তুলে ধরতে পারলে প্রজাতন্ত্রের নির্যাসটুকু পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাস।

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্রদিবস। রাজা-গজার নয়, দীর্ঘতম প্রজাটির জন্যও উৎসর্গকৃত এই দিনটি। ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের সেরা আধার ভারতীয় সংবিধানের আত্মপ্রকাশ। বাবাসাহেব আম্বেদকরের সযত্ন লালনে। ব্রিটিশদের তৈরি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টকে (১৯৩৫) বাতিল করে বলবৎ হল ধর্মনিরপেক্ষ এই বিশাল দেশের পরমগ্রন্থ ভারতীয় সংবিধান। শপথ নেওয়া হল যে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান বলে পরিগণিত হবে। এই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের চোখে। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ প্রত্যেকের ভোটাধিকার বলবৎ হল। এইটি হচ্ছে স্বাধীনত্তোর ভারতের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন যার শেকড় ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, একেবারে চক-মেলানো প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত।

এই প্রজাতন্ত্রের ধারনার সঙ্গে নারীমুক্তির ধারণাটিও একেবারে সূঁচসুতোয় গাঁথা। কেননা একটি সমাজের ভালমন্দ প্রায় সবটাই নির্ভরশীল সেই সমাজের শারীরিক অবস্থানের ওপর। গৃহদেবীকে পেছনে ফেললে পুরো সংসারটাই হবে পেছনে টানা শকটের মত। এগিয়ে যাবার বদলে কেবলই পিছিয়ে পড়া। তাই ইন্দ্রাণীর মুখে উত্তরবঙ্গের অরণ্যঘেষা জনপদ বেলাকোবায় মহিলা অরণ্যরক্ষীদের কথা শুনে প্রাণ জুড়োলো। চোরাশিকারীদের নড়াচড়া ধরতে, গাছ কাটায় ব্যস্ত অবৈধ কুড়োলের কোপ শুনতে, বন্য প্রাণীর শুশ্রূষা করতে এদের কোনও জুরি নেই। অল্প কিছু মাসোহারার বিনিময়ে ঘরসংসার সামলে সাত তাড়াতাড়ি শুরু হয় এদের পরিক্রমা। সূর্য ডুবলে আবার ঘর। পথের ধারে কোথাও পদদলিত ঘাসের গোছা, কাদার ওপর জুতোর দাগ কিংবা বাঘের সঙ্গী ফেউ-এর আর্তনাদ -- সন্দেহজনক কিছু দেখলেই এরা রিপোর্ট করেন নিকটবর্তী বিট অফিসে। প্রাথমিক ভাবে সাবধান করাটাই এদের কাজ। আর সেটা এরা করেন অত্যন্ত সততার সঙ্গে। বনের ভেতর জায়গায় জায়গায় নুন (সল্ট লিক) ছড়িয়ে রাখা, জল খাবার জায়গাগুলিতে পানীয় জল আছে কিনা দেখা অরণ্যের নানাদিকে এই কল্যাণস্পর্শ বনসংরক্ষণের কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে খুব ভাল ভাবেই।

ছবিও দেখলাম এই কল্যাণীদের। শীতের কুয়াশাঘেরা বনের প্রান্তে নানা রঙের শাড়ি, সোয়েটারে উজ্জ্বল হাসি মুখ কতগুলি, যেন সোচ্চারে বলছে এই অরণ্য আমার, এই দেশ আমার। এর ভলমন্দ রক্ষার দায়িত্বও আমাদেরই। প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য নির্দিষ্ট কোন সঙ্গীত থাকলে সেটিকেও হতে হত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত -- আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে...।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের
www.gandhisevasangha.org
ওয়েব সাইট দেখুন
মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণে সম্প্রতি যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন:

১। ডাঃ তাপস চট্টরাজ	৬৫,০০০ টাকা
২। শ্রীমতি অমিতা দত্ত	৪২,৫০০ টাকা
৩। শ্রীমতি কৃষ্ণা চক্রবর্তী	২৫,০০০ টাকা
৪। শ্রীমতি পারিজাত কুমার	৫,০০০ টাকা
৫। শ্রীমতি শিবাণী দত্ত	৫,০০০ টাকা
৬। ডঃ সরোজ মাইতি	৫,০০০ টাকা

জনমুখী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি – সময়ের অনিবার্য দাবি

দেবাশিস ভট্টাচার্য্য

জনমুখী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১৫ -- এই শিরোনামে ইন্টারনেটে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে একটি সময়োপযোগী সুচিন্তিত খসড়া দেখে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত কিছু জরুরি বিষয় উল্লিখিত প্রস্তাবনায় সংযুক্ত এবং বাস্তবায়িত করার দাবি নিয়ে এই প্রতিবেদন। আমরা বিশ্বাস করি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিশেষত দেশের যাঁরা অধিকাংশ সেই গ্রামীণ, প্রান্তিক, অসহায় মানুষজনের কাছে একটু সুস্থভাবে বাঁচার দিশা হিসাবে প্রতীত হবে। পলিসি এবং প্রতিশ্রুতির সীমানা ছাড়িয়ে কার্যকর হয়ে উঠবে। উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তির ছিঁটেফোঁটা থেকে এই চিরবঞ্চিত মানুষগুলি আর বঞ্চিত থাকবেন না।

আমরা ভুলে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যে দারিদ্র্য গরীব মানুষেরা সৃষ্টি করেনি। আমরা যে ব্যবস্থা বানিয়েছি, যে প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্ম দিয়েছি, যে সূত্রবদ্ধ ধারণায় মুখবুঁজে মোহর লাগিয়েছি -- সে সবের মিলিত যোগফল এক আকাশছোঁয়া বৈষম্য -- মানুষের উপর যা কৃত্রিম ভাবে, বাহ্যিক রূপে আরোপিত। এবং বাহ্যিক বলেই তা অপসারণযোগ্য। বনসাঁই টব থেকে তুলে এনে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশে তাদের সৃজনী শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে। উন্নয়নের প্রাথমিকতা নির্দ্দিষ্ট করতে হবে -- মোবাইল? না, পানীয় পরিশ্রুত জল? টিভি? না, শৌচাগার? বাইক? না, বিদ্যুৎ? মানবজাতির পরিকল্পিত আত্মবিলোপের কথা? না, সুস্থ মানবিক জীবনধারণের নূন্যতম চাহিদাগুলি -- যেমন, পরিশ্রুত পানীয় জল, দৈনিক তিনথালা সুষম স্বাস্থ্যকর খাবার, বাসযোগ্য সুপরিবেশ, নিকাশী নালা, শৌচাগার, ধোঁয়ামুক্ত ঘর, প্রতি ঘরে মশারি, শিশুদের সময়মত টিকাকরণ, গ্রামে গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মুক্ত চিকিৎসা, সুলভ/মুক্ত ওষুধ ইত্যাদি? ধন নয়, মান নয়। শুধু একটি চাহিদা। ৬৭ বছর পেরিয়ে আসা বিশ্বের এক অগ্রণী গণতন্ত্রের প্রবীণ স্বাধীনতার কাছে এই সামান্য অত্যাবশ্যক স্বপ্নগুলি পূরণের সদিচ্ছার আশা করা কি সত্যিই বাড়াবাড়ি কিছু? তা যে নয় উল্লিখিত প্রস্তাবনার ছত্রে ছত্রে সে কথা বলা হয়েছে -- যেমন বলা হয়েছিল ১৯৮৩ এবং ২০০২ সালের বিগত দুটি স্বাস্থ্যনীতিতেও। যদিও দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সার্বিক অবক্ষয় ওই প্রতিশ্রুতির বেলুনকে প্রায় চুপসে দিয়েছে একথা অনস্বীকার্য। ব্যাঙের ছাতার মত সারা দেশে গজিয়ে ওঠা বিশাল স্বাস্থ্য পরিষেবা শিল্পের ঈর্ষণীয় ১৫ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও! বাস্তবে যা জাতীয় আর্থিক বৃদ্ধির প্রায় তিনগুণ। হ্যাঁ স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ওষুধপত্র, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তির ব্যয়বহুল খরচ প্রতিদিন বহু মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে -- যে তথ্যে পৌঁছতে NSSO-র দ্বারস্থ না হলেও চলবে। তবুও, জাতীয় আর্থিক বৃদ্ধি কিছুতো ঘটেছে, ঘটছে Fiscal Capacity-র বৃদ্ধিও।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত জনস্বার্থবাহী কয়েকটি দাবিতে -- যেগুলিকে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করি -- আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই বিশ্বাসে যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে এগুলির যথাযত সংযুক্তি ও বাস্তবায়ন ব্যতীত প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় :-

১) স্বাস্থ্য একটি মৌলিক অধিকার -- এই দাবিটি প্রাথমিক। বর্তমান আর্থ-সামাজিক সার্বিক প্রেক্ষাপটে এই দাবিতে আমরা আপোসহীন। ব্রাজিল, থাইল্যাণ্ড সহ অনেক শিল্পোন্নত দেশেই এই আইন চালু করে সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। নানান আন্তর্জাতিক চুক্তির স্বাক্ষরকারী হিসেবে এই অধিকারকে জাতীয় আইনে পরিণত করার অধিকার আমাদের আছে। বিভিন্ন সময়ে আদালতের নির্দেশ -- মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক এই আইনকে বাস্তবে মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের বাধ্যতা হিসাবেই গণ্য করেছে। এই আইনে অবশ্যই জল, নিকাশী ব্যবস্থা, খাদ্য সুরক্ষা, বায়ুদূষণ, স্বাস্থ্যের অধিকারসমূহ সহ যথার্থ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগের অবকাশ থাকবে। স্বাস্থ্যকে মূল মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জনস্বাস্থ্যে অধিকতরও ব্যয়ের অবকাশও এই বিলটিতে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

২) সরকারী হাসপাতালে বিশেষ করে দরিদ্রতম মানুষজনের জন্য মুক্ত চিকিৎসা, ওষুধ, পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিপদকালীন পরিষেবা, রোগী পরিবহন ব্যবস্থার দাবি -- Primary to Tertiary সবরকমের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই।

৩) জেনারিক ড্রাগস -- সতত বর্দ্ধমান ব্র্যান্ডেড ওষুধের মূল্যের সাথে জেনারিক ওষুধের মূল্যের পার্থক্য আকাশ পাতাল। শুধু ওষুধের খরচ মেটাতে (প্রায় ৮০ শতাংশ) বহু মানুষ প্রতিদিন দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। তাই যথাযথ মান ও মাত্রায় জেনারিক ওষুধের প্রচলন গ্রাম শহর নির্বিশেষে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। মান, মাত্রা, প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার দায় নিতে হবে সরকারকেই। তাদের বর্তমান পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে এ কাজ হাসিল করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে আমাদের জাতীয় গর্ব পাব্লিক সেক্টর ওষুধ কোম্পানিগুলি -- যেগুলিকে বর্তমানে অকেজো করে রেখে দেওয়া হয়েছে। যেমন IDPL, হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক, বেঙ্গল ইমিউনিটি, বেঙ্গল কেমিক্যাল, স্মিথ স্ট্যানিসস্ট্রীট প্রভৃতি কোম্পানিগুলি। সরকারি তত্ত্বাবধানে এদের পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে জরুরি জেনারিক ওষুধই শুধু নয়, জনস্বার্থ আইনের সুযোগ নিয়ে Compulsory License ব্যবহার করে বহুজাতিকদের অত্যাবশ্যক বহুমূল্য পেটেন্টেড ওষুধগুলিও উৎপাদন ও বাজারজাত করা যেতে পারে, সুলভে। একদিকে দেশের পরীক্ষিত ঐতিহ্যবাহী এই পরিকাঠামোগুলির পুনরুজ্জীবন, অন্যদিকে, বহুজাতিক ও দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলির একাধিপত্যে নিয়ন্ত্রণ আনার এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। অবশ্যই জনস্বার্থের তাগিদে।

৪) বিনা প্রেস্ক্রিপশনে ওষুধ বিক্রি বন্ধ হোক -- বেড়ে চলা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর সাথে সঙ্গতি রেখে ওষুধশিল্পও নিত্য নতুন আবিষ্কারে অপরাগ থাকছে। সর্বোপরি খোলাখুলি ওষুধের OTC বিক্রয় এই অবস্থানে আরও বেশি করে সঙ্গীন করে তুলছে। সেজন্যই অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রেস্ক্রিপশন বিনা ওষুধ বিক্রির উপরে অবিলম্বে লাগাম টানা দরকার বলে আমরা মনে করি।

৫) অযৌক্তিক তরল ওষুধ -- বিভিন্ন ওষুধের সমাহারে প্রস্তুত তরল ওষুধ, যেমন -- কাফ্‌সিরাপ, টনিক, ইত্যাদি, বাস্তবত অযৌক্তিক, অকাজের। ফারমাকোলজিতে নাকি এমনই নির্দেশ, এমনই ধারণা বহুদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসকদেরও। এগুলিকে চালু রেখে কাদের স্বার্থ বজায় রাখা হয়? হ্যাঁ, জনস্বার্থে এগুলি অবিলম্বে নিষিদ্ধ হোক।

৬) নিষিদ্ধ ওষুধ -- UK/USA-র মতো বিদেশী বাজারে নিষিদ্ধ বহু ওষুধের বাজার আজও এদেশে রমরমা। কেন? কীভাবে? কাদের স্বার্থে? বন্ধ হোক এই অনৈতিক ব্যবসা।

আমরা যে ব্যবস্থা বানিয়েছি, যে প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্ম দিয়েছি, যে সূত্রবদ্ধ ধারণায় মুখবুঁজে মোহর লাগিয়েছি — সে সবের মিলিত যোগফল এক আকাশছোঁয়া বৈষম্য -- মানুষের উপর যা কৃত্রিম ভাবে, বাহ্যিক রূপে আরোপিত। এবং বাহ্যিক বলেই তা অপসারণযোগ্য।

৭) সুপারিশ ব্যবস্থা -- চিকিৎসা সেবায় রোগীকে অন্যত্র সুপারিশ করে পাঠানোর ব্যবস্থা সরকারি ক্ষেত্রে চালু আছে। সেক্ষেত্রে CMOH/ Dy. CMOH-এর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে থাকুক এই প্রয়োজনভিত্তিক ক্ষমতা। স্থানীয় সাধারণ মানুষের হুজ্জুতির হাতে নয়।

৮) জল -- বেশীরভাগ অসুখের চিরন্তন কারণ। সর্বোচ্চ প্রাথমিকতায়, বিশেষত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থার দাবি অগ্রাধিকার পাক জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে।

৯) স্বাস্থ্য গবেষণা -- স্বাস্থ্য একটু জ্ঞানসর্বস্ব বিষয়। প্রতিদিন সেখানে নতুন অগ্রগতি, নতুন কনসেপ্ট, তাই, সার্বিক স্বাস্থ্যব্যয়ের অন্তত পাঁচ শতাংশ স্বাস্থ্য গবেষণা খাতে নির্দ্ধারিত থাকুক -- মেডিক্যাল কলেজগুলি সহ সরকারি বেসরকারি গবেষণাকেন্দ্রগুলির পুনরজ্জীবনের জন্য।

১০) রক্ত এবং রক্ত সরবরাহ -- বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রে এটি একটি নিদারুণ সমস্যা। স্বীকৃত বা অধিকৃত ব্লাড ব্যাঙ্কের নেটওয়ার্ক এমন কিছু নয় যার দ্বারা জেলায় জেলায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নিরাপদ রক্তের প্রয়োজনীয় যোগান ঠিক রাখা যায়। এই সমস্যা নিরসনে ব্লাড ব্যাঙ্ক নেটোয়ার্কের প্রয়োজনীয় বিস্তার হোক।

১১) ওষুধ -- ওষুধের মান, মাত্রা, প্রাপ্যতা বজায় রাখতে, বিশেষত জরুরি ওষুধের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন সতর্ক নজরদারীর। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেন তা পুরোপুরি কার্যকারী হয় না -- এ প্রশ্নে আমরা চিন্তিত। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২) মেডিকো সার্জিক্যাল বিজ্ঞাপন -- দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে সহজ, সরল, অশিক্ষিত, সেখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রলোভন দেখানো দেদার বিজ্ঞাপন জনস্বার্থেই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত -- তা ৯৫ শতাংশ হার্ট সার্জারির গ্যারান্টি ঘোষণা হোক, কিংবা, লিপো সাকশন সার্জারী বা কসমেটিক সার্জারির আপাত সরল হাতছানিই হোক।

বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষিত হোক। উল্লেখিত বারোটি জরুরি দাবি সেখানে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হোক। ভুললে চলবে না যে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের সুস্বাস্থ্য অধরাই থেকে যাবে। উন্নয়নের শতেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। তাই, দ্বার্থহীনভাবে জনস্বাস্থ্যভাবনার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটুক প্রস্তাবিত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে।

সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের অন্ধকারময় জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নতুন প্রভাতের সূচনা হোক -- দেরিতে হলেও আমরা অপেক্ষায় থাকব। এই বোধে, এই বিশ্বাসে...।

লেখাটির একটি ইংরেজি প্রতিবেদন ''Inclusion in the Proposed National Health Policy 2015 Draft'' change.org-এর মাধ্যমে সারা দেশে অনেকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক https://change.org তে দেখতে এবং স্বাক্ষর করতে পারেন।

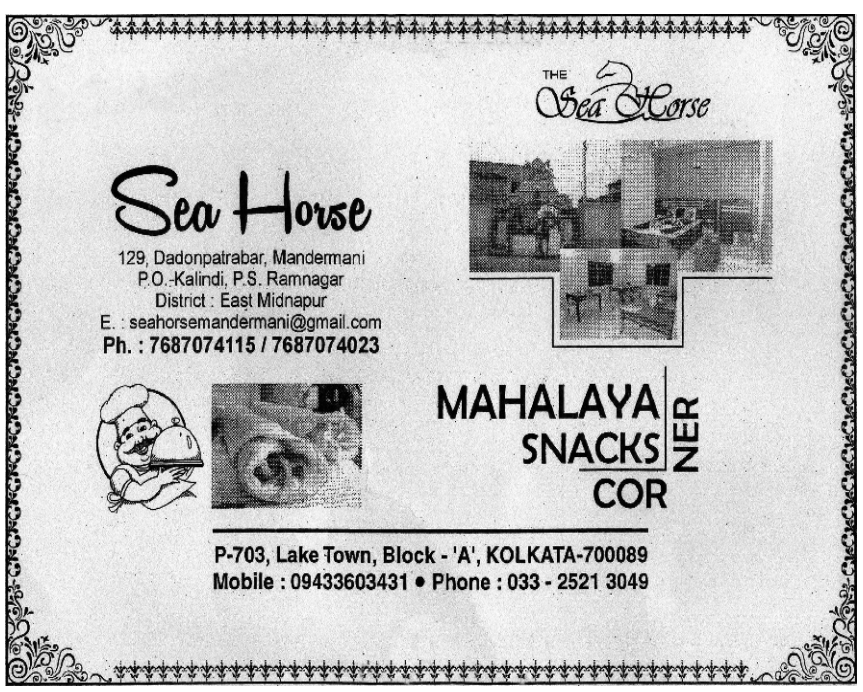

স্বামী বিবেকানন্দ: একটি মুক্তির দিশা

কল্যাণকুমার সরকার

"....Vivekananda searched...for an answer to the question of India's historical destinies, of the ways and means of transforming it (i.e. India) into a wealthy, strong and independent state. He believed that the principal builders of future India are the people..."---- V. Brodov, *Indian Philosophy in Modern Times*, Progress Publishers, Moscow, 1984, p.210.

কথামুখ:

আজকের ভারতীয় সমাজ হল যেন ক্রম অবক্ষয়ের শিকার এক বিপন্ন ও বিপর্যস্ত সমাজ। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ক্রম অবক্ষয়ের ধারাবাহিক ধাক্কায় ভারতীয় সমাজে আজ যেন মারাত্মক আকারে মারণ ঘুণ ধরেছে। ঘুণ পোকাদের সমবেত ও সম্মিলিত করাল গ্রাসে এই সমাজ আজ যেন অনেকটাই অন্তঃসারশূণ্য ঝরঝরে ও ফুসফুসে হয়ে পড়েছে। সমাজ জীবনের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, মূল্যবোধ, মানসিকতা প্রভৃতি সকল কিছুই যেন আজ ক্রম অবক্ষয়ের চরম শিকারে পরিণত হয়েছে। এমনকি ভারতীয় সমাজ জীবনের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দেশনীতি -- প্রভৃতি সকল কিছুতেই যেন চলছে অবক্ষযের প্রবল জোয়ার। তার উপর জীবপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, দেশভক্তি -- ইত্যাদি সকল কিছুতেই ভারতীয় সমাজে আজ চলছে চূড়ান্ত ফাঁকিবাজি তথা সীমাহীন অন্তঃসারশূণ্যতা। অসম্ভব স্বার্থচেতনা ও সীমাহীন স্বার্থপরতা গ্রাস করেছে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে। তাই তো পরার্থপরতা তথা পরের জন্য ভাল কিছু করার মানসিকতা এবং সমাজে সকলের প্রতি অল্পবিস্তর মমত্ববোধের প্রবণতা আজ যেন ধীরে ধীরে আমাদের অন্তর থেকে, আমাদের যুব সমাজের হৃদয় থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই আমাদের সমাজ অত্যন্ত অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। এই অবক্ষয়মান অবস্থা থেকে আমাদের যদি সত্যি সত্যিই মুক্ত হতে হয় এবং মুক্ত হয়ে যদি ভারতবর্ষে এক সুস্থ-মুক্ত-বুদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে ভারত-গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ-সমৃদ্ধ জীবন, সেবাপরায়ণ কর্ম-প্রয়াস এবং প্রেরণাদায়ক বাণী রচনাকে আমাদের অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ ও প্রতিপালন করতে হবে। একমাত্র তাহলেই হয়তো আমরা আমাদের যুবসম্প্রদায় তথা আমাদের সমগ্র ভারতীয় সমাজ অবক্ষয়ের মারণ তাণ্ডব থেকে মুক্তি পেয়ে ক্রম-অগ্রগমন ও ক্রম-উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে -- এ কথা আমরা শুধু একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করিনা, হৃদয়ের গোপন কোণে নিবিড়ভাবে উপলব্ধিও করি।

অবক্ষয়মান ভারতীয় যুব সমাজের পরিত্রাতা হিসাবে বিবেকানন্দ:

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, আজকের ভারতবর্ষের সার্বিক অবক্ষয়মুখী যুব সমাজকে অবক্ষয় ও অবনমন থেকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দই হলেন অন্যতম পরিত্রাতা স্বরূপ। বস্তুত আজকের অবক্ষয়মান ভারতীয় সমাজের স্বার্থন্ধ, সংকীর্ণমনা ও পরশ্রীকাতর যুব সম্প্রদায়কে উদার, পরার্থপর ও পরোপকারী হিসাবে গড়ে তুলতে হলে যথার্থ 'মানুষ' হয়ে ওঠা সম্পর্কিত স্বামী বিবেকানন্দের সুগভীর নির্দেশকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করতেই হবে। কারণ তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে আন্তরিকভাবে এই আশাবাদ পোষণ করতেন যে, 'মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট তেজস্বী আত্মবিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্য কিছু অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির কাছে আর সবই শক্তিহীণ হইয়া যাইবে।' (স্বামী বিবেকানন্দ, *আমার ভারত জাগো*, পৃঃ ২২)। বলাই বাহুল্য, এইরকম বীর্যবান, সাহসী, তেজস্বী, কর্মমুখী ও সদর্থক ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন যুবক সম্প্রদায় গড়ে তোলা সংক্রান্ত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাদর্শনই আজকের দিনের অবক্ষয়মুখী ভারতীয় যুবসমাজকে অবক্ষয়ের গহীন আঁধার থেকে মুক্ত করে তাঁকে কর্মোদ্যোগী ও পরিশ্রমী করে তুলতে পারে এবং তাকে অগ্রগতি ও উন্নয়নের আলোকোজ্জ্বল জগতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। অবশ্যই পারে।

স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের সুপ্ত হৃদয় দৌর্বল্য এবং মানসিক হতাশা দূর করে তাকে উদ্যমী, উদ্যোগী, সাহসী, বীর্যবান ও তেজস্বী পুরুষ-সিংহে পরিণত করতে চেয়েছেন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। তাইতো তিনি ভারতীয় যুবগণকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রেরিত করে দৃপ্ত নির্দেশে বলেছেন, 'ওঠো, ওহে সিংহগণ, এই বিভ্রান্তিকে দূর করে দাও যে তোমরা হলে ভেড়া মাত্র' (Get up, O Lions, shake off the delusion that you are sheep)। শুধু তাই নয়, তাদের প্রতি তাঁর আরও সুগভীর নির্দেশ হল, 'ওঠো, জাগো, প্রাপ্য অর্জন না করা পর্যন্ত থেমে যেও না' (উত্তিষ্ঠিতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ নিবোধতঃ বা Rise, Awake, Stop not till the goal is achieved)। বলাই বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দের এই সুগভীর নির্দেশই অবক্ষয়িত ও অপচয়িত যুব সম্প্রদায়কে কর্মচেতনায় সঞ্জীবিত এবং উন্নয়ন-প্রবণতায় অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হবে। হবেই।

শুধু তাই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের সুনিবিড় ভারতপ্রেম তথা স্বদেশিকতা বোধ আজকের অবক্ষয়মুখী যুব সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমহীনতা, অন্ধ প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, লোভ লালসা ও নীতিহীনতার গভীর পাঁক থেকে উদ্ধার করে তাকে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে এবং তাকে একজন খাঁটি নাগরিকে পরিণত করতে পারে। আর এই লক্ষেই তো ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে স্বদেশপ্রেমের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত করে বলেছিলেন, 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল -- আমি ভারতবাসী... ।...সদর্পে ডাকিয়া বল -- ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।...বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।' (স্বামী বিবেকানন্দ, 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ, দ্রষ্টব্য ভোলানাথ ঘোষ ও মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত *গদ্য বিচিত্রা*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লী, ১৯৭৭, অষ্টাদশ প্রকাশন, ২০০৬, পৃঃ ৮৮-৮৯)।

শুধু ভারতপ্রীতি বা দেশসেবার আদর্শ মাত্রই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানব সেবা তথা দেশবাসীর সেবা এবং জীবসেবা সংক্রান্ত স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও আজকের আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব ভারতীয় যুব সমাজকে দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক ও একাত্ম হয়ে উঠতে এবং মানুষ ও জীব সমাজের প্রতি সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করে থাকে। তাইতো তিনি ভারতবাসীকে একে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সুগম্ভীর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'হে ভারত ভুলিও না --...নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। সদর্পে বল -- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই' (স্বামী বিবেকানন্দ, 'বর্তমান ভারত', প্রবন্ধ, পূর্ববৎ)। বলাই বাহুল্য, দেশবাসীর প্রতি সেবা সংক্রান্ত স্বামী বিবেকানন্দের এই আকুল আহ্বান আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণমনা ভারতীয় যুব সমাজকে দেশবাসীর সাথে একাত্ম হতে এবং দেশবাসীর জন্য স্বার্থশূণ্য কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে অবশ্যই সাহায্য করবে। সঙ্গে সঙ্গে জীব সেবা ও মানব সেবা বিষয়ক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও আমাদের সকলকে এবং আমাদের যুব সমাজকে ঈশ্বর জ্ঞানে জীব সেবার মহান ব্রততে অনুপ্রাণিত করে থাকে। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর জীবকেই শিব ঠাকুর হিসেবে গণ্য করে তাকে (জীবকে) সেবা করার মহান বার্তা দিয়ে গেছেন আমাদের। আবার ঠিক একই বার্তা দিয়ে তাঁর পরম প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও জীবেশ্বর সেবার আকুল আকুতি জানিয়ে বলেছেন--

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জীবেশ্বর সেবা এবং জীব ও মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার এই যে সুমহান বার্তা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন, সেই বার্তাই আজকের অবক্ষয়মান ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে জীব ও মানুষের প্রতি সেবার ব্রতে তথা যথার্থ মানব ধর্মে ব্রতী করে তুলতে পারবে এবং তাকে সেবাপরায়ণ ও ত্যাগপ্রবণ যথাযথ ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করতে পারবে এবং তখনই এই আমূল পরিবর্তিত সেবাব্রতী, ত্যাগব্রতী ও কর্মব্রতী যুব সম্প্রদায়ই এক সুস্থ, সুন্দর, সুখী, সুষম ও সুসংহত ভারতীয় সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। হবেই।

এইরকমভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, কর্ম, ভাবনা ও বাণী রচনা আজকের ক্রম অবক্ষয়মান ভারতীয় যুব সমাজকে অবক্ষয় ও অবনমনের হাত থেকে উদ্ধার করে তাকে অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করে তুলতে পারবে বলে একান্তভাবেই বিশ্বাস করি।

আমাদের উপলব্ধি:

সুতরাং আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একান্তই অনুভব করতে পারি এবং একান্তভাবে করিও যে আজকের ঘুণ ধরা ভারতীয় যুব সমাজকে মাথা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনকে যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রতিপালন করতে হবে এবং তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) দেশসেবা, সমাজসেবা, মানবসেবা ও জীবসেবার আদর্শে এবং তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, ভালোবাসা ও কর্মমুখীনতার ব্রতে ব্রতী হতে হবে। তাহলেই অবক্ষয়ের মায়াজাল কাটিয়ে ভারতীয় যুব সমাজ দৃপ্ত মহিমায় অত্যন্ত অগ্রগতির অমল আলোয় আলোকিত ও আলোড়িত হয়ে উঠতে পারবে, পারবেই, সন্দেহ নেই।

'মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট তেজস্বী আত্মবিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২ পাতার পর

তাড়াতাড়ি সম্ভব একতলার কাজ শেষ করে বহির্বিভাগটিকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে। Dental, Eye, ENT ও অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে থাকবে USG, ECG, X-Ray, ও Pathological Laboratory. এর জন্য অন্তত চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দ্রুত গতিতে কাজ চলছে।

হাসপাতালের ছ'তলা মূল বিল্ডিংএর বেশিরভাগ সিভিলের কাজ শেষের মুখে। আশা করা যায় সকলের সাহায্য ও দানে এই অঙ্কটি অল্প দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যাবে।

হাসপাতালটি দ্রুত উদ্বোধনের লক্ষ্যে শ্রী সুজিত বোসের সাথে সাথে ডাঃ তাপস কুমার চট্টোরাজ, ডাঃ শুভদীপ পাল, শ্রী মহেশ শর্মা, শ্রী ধীমান ভট্টাচার্য, শ্রী জয়ন্ত সাহা, সহ বিভিন্ন পেশার বহু মানুষ আন্তিরিক ভাবে সহায়তা করছেন। আশা করা যায়, সকলের সাহায্য ও দানে আর কয়েক মাসের মধ্যেই মানব কল্যাণে উৎসর্গকৃত অব্যবসায়িক এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণ ভাবে চালু হয়ে যাবে।

৫) লাইব্রেরী -

সাধারণ পাঠককুল বই পড়ার এবং লাইব্রেরীর প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে, এ কথা প্রায়ই শোনা যায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আনন্দের বিষয়, গান্ধী সেবা সংঘের লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা গত কয়েক বছরে তিন হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজারে পৌঁছে গেছে। এখন নিয়মিত সদস্য সংখ্যাও প্রায় ২০০ এবং প্রতি মাসে কয়েকজন নতুন সদস্যপদ গ্রহন করছেন। দৈনিক গড় উপস্থিতি ১৫ জন। গত বছর দক্ষিণ দমদম পৌরসভা থেকে ষোল হাজার ও উঃ চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার বিভাগ থেকে বারো হাজার টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। গত বছরের মত এ বছরেও ডঃ শ্রীমতি রেখা রায়চৌধুরী লাইব্রেরীর উন্নতি কল্পে দশ হাজার টাকা দান করেছেন। এবছরে দশ হাজার টাকার বই কেনা হয়েছে এবং অলপ দিনের মধ্যেই আরো দশ হাজার টাকার বই কেনা হবে। পরিচালন সমিতির সদস্য শ্রী শম্ভু বণিক মহাশয় লাইব্রেরীতে একটি নতুন কমপ্যুউটার দান করেছেন। লাইব্রেরীর এতখানি উন্নতির অন্যতম রূপকার, ৮৪ বছরের উদ্যোমী পুরুষ শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই। প্রতিদিনের স্বেচ্ছাশ্রম ছাড়াও তিনি লাইব্রেরীর জন্য এক নিয়মিত দাতা। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বহু মূল্যবান বই লাইব্রেরীর জন্য দান করেছেন। লাইব্রেরীটি শুধুমাত্র বই দেওয়া নেওয়ার জায়গাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমনা বহু নানা বয়সের মানুষের নিয়মিত অনাবিল মিলন ও চর্চ্চা কেন্দ্র। কিন্তু লাইব্রেরিটি ঠিকমত পরিচালনা ও উন্নতি ঘটাতে বেশ কিছু উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন। এব্যাপারে আগ্রহীদের আহ্বান করা হচ্ছে।

লাইব্রেরী পরিচালনার দায়িত্বে আছেন শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রী পি. চক্রবর্তী।

৬) শিক্ষা: সংঘের পথচলা শুরু হয়েছিলো গান্ধীজীর ভাবধারায় বুনিয়াদি পাঠশালা স্থাপনের মাধ্যমে। এযন সেই ছোট্টো পাঠাশালা সরকার অনুমোদিত পৃথক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও স্কুল দুটির দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক উন্নতির জন্য সংঘ সর্বদাই সচেস্ট। বিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাসের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহিত করবার জন্য বহু বছর ধরে সংঘ প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এককালীন বৃত্তি প্রদান করে। সম্প্রতি সংঘের পরিচালন সমিতির অন্যতম প্রাক্তন সদস্যা স্বর্গতা মায়া রায় ও তাঁর স্বামী, সংঘের আজীবন সদস্য স্বর্গত শরদিন্দু রায় ট্রাস্টের সৌজন্যে বৃত্তির পরিমাণ বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, ট্রাস্ট কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুদৃশ্য মেডেলও তবে, দুঃখের বিষয়, প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা যোগ দিলেও কোন অজানা কারণে মাধ্যমিক বিভাগের কোন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না। গান্ধী সেবা সংঘ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী দুঃস্থ পরিবারের সন্তান। আশা করা যায় তাদের কথা চিন্তা করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করবেন।

৭) সাংস্কৃতিক বিভাগ

সংঘ সেবার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক চর্চ্চা বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বর্ষবরণ; গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী; স্বাধীনতা দিবস পালন, বিজয়া সম্মেলনী ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান যথাযত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাণিক্য মঞ্চটি সংঘের নিজস্ব অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও সারা দমদমের বহু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাদের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করে। মাণিক্য মঞ্চে গত এক বছরে এরকম ৩০টির বেশী অনুষ্ঠান হয়েছে। সম্প্রতি একটি নতুন সাজঘর তৈরী হয়েছে ও বিধায়ক শ্রী সুজিত বোসের সহায়তায় হলের মেঝেটিতে টাইলস লাগানোতে অডিটোরিয়মটি এখন অনেক সুন্দর হয়েছে। তবে, এখনও বেশ কিছু কাজ বাকি আছে। এব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের জন্য স্থানীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বোসের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক উপসমিতির দায়িত্বে আছেন শ্রী ধনঞ্জয় আঢ্য।

৮) শিশু বিকাশ কেন্দ্র

মূলত পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সৃজনশীলতা বাড়ানো ও সার্বিক বিকাশে সহায়তার জন্য সংঘ পরিচালিত এই কেন্দ্রটিতে প্রতি রবিবার সকালে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে নিয়মিত আঁকা শেখার আসর বসে। এক সময় নানা কারণে এর সদস্য সংখ্যা খুব কমে গেলেও বর্তমানে আবার তা বেড়ে এখন চল্লিশ জনের বেশী হয়েছে। মাঝে মাঝে এই শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। গত ২রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী দিবসে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

এখন মাত্র একজন শিক্ষিকা সদস্যদের আঁকা শেখান। এই কেন্দ্রটির অনেক উন্নতির অবকাশ আছে। আঁকা শেখার সাথে সাথে গল্প বলা, আবৃত্তি, গান ও নাচ শেখানো, চলচ্চিত্র দেখানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা গেলে শিশুরা অত্যন্ত উপকৃত হয়। এজন্য চাই উপযুক্ত ট্রেনার ও কয়েকজন উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবী।

শিশু বিকাশ কেন্দ্রটির উন্নতির জন্য HongKong এর Samdasani Foundation এবছর চার হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন। শিশু বিকাশ কেন্দ্রর দায়িত্বে আছেন শ্রীমতি জবা গুহঠাকুরতা।

DONATE REGULARLY FOR THE NOBLE CAUSE

DONARS ARE ELIGIBLE TO GET ITAX RELIEF U/S 80G OF INCOME TAX DEPT.

৯) সংঘ পত্রিকা 'সেবক'

বহু দিন ধরেই সংঘের বর্তমান পরিষেবা ও কার্যকলাপ, অতীতের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা - এই সব বিষয় সবাইকে জানানোর মাধ্যম হিসাবে নিজস্ব একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভুত হচ্ছিল। অবশেষে ২০১৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে গান্ধী সেবা সংঘের মুখপত্র রূপে, শ্রীমতি জবা গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় দ্বিমাসিক পত্রিকা 'সেবক' প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। এখন পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় ১০০০ টি কপি করে মোট ৮টি সংখ্যা সময় মতই প্রকাশিত হয়েছে। সংঘ সংবাদ ছাড়াও আমাদের চারপাশের জ্ঞানী গুনী মানুষজনের তাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিভিন্ন স্বাদের লেখা ছাপিয়ে পত্রিকাটিকে সুখপাঠ্য ও মান বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজের সমাদর লাভ করেছে। পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রী নীতিশ মুখার্জীর সহায়তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১০) সংঘ ভবন

বেশ কয়েক বছর পরে এবার সংঘ ভবনের অনেকটাই সংস্কার ও রঙ করা সম্ভব হয়েছে। সংঘ ভবন, সেবা নিবাস, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাত্র জলের সংযোগ থাকায় মাঝসাঝে সেবা নিবাসে জলের সমস্যা হয়েছে। হাসপাতালের ডীপ টিউবয়েল থেকে একটি পাইপ লাগিয়ে এর সাময়িক প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছরে বাকী সংস্কারের ব্যবস্থা করে পুরো বাড়ীটা রঙ করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

১১) অর্থ সংস্থান ও হিসাব

বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য লাভ ও সংঘের বিভাগগুলি থেকে নিজস্ব আয় ভালো হওয়াতে বছরটির আর্থিক পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল বলা যেতে পারে।

এ বছর ফ্রান্সের প্ল্যানেট ক্যুয়র থেকে সংঘের মেডিক্যাল ও ক্যানসার এবং হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য গত দুবছরের জন্য মোট ৮ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ায় পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। সম্প্রতি সংস্থার পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য সংঘের নিয়মিত পরিষেবাগুলি ও হাসপাতাল প্রকল্প পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, আগামী দিনগুলিতে সংস্থাটি তাদের সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত করবে। সংঘের পরিচালন সমিতির সদস্য শ্রী প্রবীর গুহঠাকুরতা বহু দিন ধরে প্ল্যানেট ক্যুয়র-এর সঙ্গে যোগাযোগের কাজটি আন্তরকিতার সঙ্গে করে চলেছেন।

গত দুবছর যাবৎ সংঘের আর্থিক হিসাব কম্প্যুটারাইজড করা হয়েছে। এর ফলে নিয়মিত হিসাব রাখা, আয়কর জমা দেওয়া ও অডিট করার অনেক সুবিধা হয়েছে। এব্যাপারে সহকারী কোষাধক্ষ্য শ্রী রাম অবতার যোশি, সহকারী সম্পাদক শ্রী সুব্রত পাল এবং সংঘ সদস্য শ্রী প্রতীপ সাহা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন।

প্রসঙ্গত জানানো দরকার, হাসপাতাল প্রকল্প ছাড়া সংঘের নানা বিভাগে চিকিৎসক ও সহায়ক, লাইব্রেরী সহায়ক, অফিস সহকারী, কেয়ারটেকার, সাফাইকর্মী, ইত্যাদি সহ মোট ১২জনকে মাসিক সাম্মানিক দেওয়া হয়। অনেকদিন পর এবছর এঁদের সাম্মানিকের পরিমাণ বাড়ানো গিয়েছে।

গত বছরের মত এবারও সংঘের হিসাব পরীক্ষক ছিলেন M/s D. Bhattacharya & Associates, Kolkata, যারা স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই পরিষেবা দিচ্ছেন।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

গান্ধী সেবা সংঘের অন্যতম মুখ্য কাজ নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষজনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা। আর সেই জন্যই বহু বছর যাবৎ সংঘ নানা ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে, দাতব্য চিকিৎসালয়, ক্যানসার রোগীদের থাকবার জন্য 'সেবা নিবাস' তৈরী করেছে। মাঝে মাঝে ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এখন অনেক বড় ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য ১০০ শয্যার আধুনিক মানের হাসপাতাল তৈরীর কাজে হাত দিয়েছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য এসব যথেষ্ট নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ ভোগের অন্যতম কারন সচেতনতা ও সঠিক জ্ঞানের অভাব। চাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও সঠিক সমন্বয়।

সংঘের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

১) যত দ্রুত সম্ভব গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল প্রকল্প শেষ করে জনসাধারণের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

২) সরকারী ব্যবস্থার সাথে সাথে সংঘ এবারে পাড়ায় পাড়ায়, বিশেষত আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকায়, ডাক্তারদের পরামর্শ মত, তাদের সহযোগিতা, নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবির পরিচালনা করা। এজন্য একটি এল সি ডি প্রোজেকটর কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৩) এছাড়া, ক্যানসার সম্মন্ধে সাধারন মানুষের ধারণা এখনো অনেকটাই অস্বচ্ছ। নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন এলাকায় ক্যানসার সচেতনতা ও নির্নয় ক্যাম্প সংগঠিত করা হবে। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র বা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

৪) সেবা নিবাসে থাকা ক্যানসার রোগীদের হাসপাতালে যাওয়া আসার জন্য একটি উপযুক্ত গাড়ী থাকলে খুবই উপকার হয়। এ বিষয়ে সংঘ উদ্যোগী হবে।

ধন্যবাদজ্ঞাপন

গান্ধী সেবা সংঘ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয়, প্রয়োজনের দিনে নানা স্তরের নানা জায়গার বহু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন হাসপাতাল তৈরীর কাজে বহু প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, প্রশাসক ও সাধারন মানুষজন স্বতঃপ্রনোদিত ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করছেন। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রীভুমি স্পোটিং ক্লাব, পূর্ব কলকাতা নাগরিক পরিষদ ট্রাস্ট, শ্রীভূমি বিকাশ মঞ্চ, ইনার হুইল ক্লাব অব গ্রেটার কলকাতা, ইকো, নান্দনিক সহ বহু সংগঠন নানা ভাবে সাহায্য করেন। তাদের ধন্যবাদ।

সংঘের কার্যকরী সমিতির প্রত্যেক সদস্য সংঘের পরিকল্পনা ও স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আন্তরিক ভাবে প্রয়াস করেছেন ও সক্রিয় ভাবে যেকোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সংঘের সভাপতি শ্রী রঘুনাথ কুন্ডু ও কার্য্যকরী সভাপতি ডঃ হিরন্ময় সাহার সুচিন্তিত পরামর্শ সংঘের এগিয়ে চলার পথে অত্যন্ত মূল্যবান। আনন্দের বিষয়, স্থানীয় বিধায়ক এবং পৌরপ্রতিনিধি শ্রী সুজিত বোস বহু দিন ধরেই গান্ধী সেবা সংঘের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য এবং গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান।

প্রধানত তারই নেতৃত্বে হাসপাতাল প্রকল্পের কাজ চলছে।

এদের সবাইকে অন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে, সংঘের সমস্ত আজীবন ও বার্ষিক সদস্য, দাতা এবং শুভানুধ্যায়ী, প্রত্যেকের জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

পৌষ মেলা

দেবী মণ্ডল

আনন্দপিয়াসী বৈচিত্রপিয়াসী মানুষের প্রাণের মুক্তিক্ষেত্র হল মেলা প্রাঙ্গণ। কেবল বাংলায় বা ভারতের নয় সারা পৃথিবীতেই মানুষ মেতে ওঠে মিলনের উৎসবে। 'মেলা' শব্দের আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে মিলন। মানুষের সঙ্গে মানুষের, শিল্পের সঙ্গে জীবনের, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের মিলন। মেলাই হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাতের এবং ভাবসম্মিলনের সংযোগসেতু।

আমাদের মত ধর্মাশ্রিত ও কৃষি প্রধান দেশের অধিকাংশ মেলার মূলে আছে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাপার্বণ। কবি/লেখকের জন্মস্থানে বা জন্মদিনে অথবা বিশেষ কোনও ঘটনার স্মরণেও মেলার আয়োজন হয়। এছাড়া ধর্মীয় উৎসবের গণ্ডী ছাড়িয়ে আছে বইমেলা, বাণিজ্যমেলা, শিল্পমেলা ইত্যাদি। আধুনিক যুগে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত 'মল'গুলিতে গিয়ে কিংবা 'অনলাইনে' ঘরে বসেই জিনিস পত্র কেনাবেচার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মেলার মাহাত্ম্য তাতে যে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি তা ক্রমবর্ধমান মেলার সংখ্যা ও মেলায় উপচেপড়া মানুষের ভিড় দেখেই ঠাহর করা যায়।

শীতকালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের মেলা বসে। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য পৌষমেলা। এই মেলার সূচনা হয় এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সূত্র ধরে।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর (১২৫০, ৭ই পৌষ) ২০ জন সঙ্গীকে নিয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের এক ভাষণে এই দীক্ষার অন্তরতম কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন:

''সেই যে দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা।''

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন-- ''এই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?'' আরও লিখছেন, ''যখন ব্রাহ্মদের মধ্যে পরস্পর এমন সৌহার্দ্য দেখিলাম, তখন আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। আমি মনে করিলাম যে, নগরের বাহিরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতি পৌষ মাসে একটা মেলা হইলে ভাল হয়। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সদ্ভাববৃদ্ধি ও ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হইয়া সকলের উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি এই উদ্দেশে ১৭৬৭ সালের ৭ই পৌষ পলতার পরপারে আমার গোরিটির বাগানে সকলকে নিমন্ত্রণ করি।

৮-৯টা বোট করিয়া সকল ব্রাহ্মকে কলিকাতা হইতে আমি ওই বাগানে লইয়া যাই। ইহাতে তাঁহাদের সদ্ভাব ও মনের প্রীতি ও উৎসাহ প্রজ্জলিত হইয়া বাগানে ব্রাহ্মদের একটি মহোৎসব হইয়াছিল।''

দেবেন্দ্রনাথের উত্তরকালের সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে তাঁর ইচ্ছাক্রমে ৭ই পৌষের দিনটিতে প্রতিবৎসর একটি উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির এই দীক্ষার দিনটির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, ''মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন; তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না।''

শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ও উৎসবাদির ব্যয়ভার বহনের জন্য মহর্ষিদেব নিজের জমিদারি থেকে ১৮০০ টাকা বার্ষিক আয়ের স্থাবর সম্পত্তি তিনজন ট্রাস্টির হাতে সমর্পণ করে একটি ট্রাস্ট-ডিড সম্পাদন করেন। এই ডিডের মধ্যে মেলা প্রবর্তণের কথা আছে।

''ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টিগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মপ্রচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনও প্রকার পৌত্তলিকতার আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না। মদ্য-মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কোনও কালে এই মেলার দ্বারা কোনওরূপ আয় হয় তবে ওই আয়ের টাকা মেলার কিংবা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন।''

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের প্রথম মেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৪ সালের ৭ই পৌষ, ১৩০১। শান্তিনিকেতনের মন্দির বা উপাসনাগৃহ সংলগ্ন মাঠে একটি ছোট মেলার আয়োজন হয়, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে। সে মেলা ছিল মাত্র একদিনের। চারদিকে দোকান-পসার বসেছিল। সন্ধ্যায় আতসবাজী পোড়ানো হয়েছিল মন্দিরের উত্তর দিকের মাঠে। একদিনের এই মেলা বেশ কিছু বছর চলে। ক্রমান্বয়ে বিশ্বভারতীর নানা উৎসব অনুষ্ঠানের সংযোজনায় সাতই

পৌষের উৎসব চলে চারদিন ধরে। মেলার বহর বাড়তে থাকায় মন্দিরের উত্তর দিকের মাঠের বদলে তা চলে আসে পূর্বপল্লীর মাঠে।

ধনী-দরিদ্র-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এই মেলায় এসে আনন্দস্রোতে অবগাহন করার সুযোগ পায়। মেলার মাঠে সমবেত বাউল-ফকির-দরবেশের একতারায় মাতোয়ারা হয়, উদাস হয় মন। ৭ই পৌষের প্রাতঃকালীন উপাসনা থেকে শুরু করে খ্রীস্টোৎসবের দিন পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানে ধ্বনিত হয় যে বন্দনাগান তার সুরের মূর্ছনায় স্পন্দিত হয় হৃদয়। মেলার শেষ দিনে আতসবাজীর আলোয় উদ্ভাসিত মুহূর্তে যেন পথ খুঁজে পায় অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার।

কালের গতিতে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার রূপান্তর ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য' যে মেলার পরিকল্পনা -- সেই ভাবনার প্রতিফলন আজকের পৌষমেলায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ৭ই পৌষের উৎসবে মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের দিনটির যে বিশেষত্ব, তাঁর যে আনন্দময় উপলব্ধি বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে তাকে তুলে ধরার আন্তরিক নিষ্ঠা ও নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। যার মধ্যে দিয়ে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্-কে জানার অবকাশ মেলে।

৭ই পৌষের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ভোর সাড়ে চারটের গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিকের গানে। এরপর উপাসনা হয় ছাতিম তলায়। উপাসনা শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর তাঁর নাম গান...' গাইতে গাইতে উপস্থিত সকলে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করেন। ৭ই পৌষের উপাসনার সূচনা হয় নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। এরপর যে মন্ত্রটি পঠিত হয় তাহল --

ওঁ পিতা নো হসি, পিতা নো বোধি
নমস্তেহস্তু, মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়ো ভাবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্কারায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।।

যার অর্থ হল --

'তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার আমাকে মোহপাপ হইতে রক্ষা করো, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিওনা। হে দেব, হে পিতা! পাপ সকল মার্জনা করো। যাহা কল্যাণ, তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর তোমাকে নমস্কার।

সংগীত সহযোগে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠের পর সমাপ্তি সংগীতের পূর্বে পাঠ করা হয় এই মন্ত্র --

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময় , আবিরাবীর্ম্ম এধি রূদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরি ওঁ।

যার অর্থ হল --

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতি স্বরূপে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাঁহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

'শুভ-উৎসব' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে।

'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি-- এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।

৭ই পৌষের উৎসবের এই প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছে পৌষমেলার অন্তরে।

মহর্ষির ভাবনা অনুযায়ী ধর্মভাব উদ্দীপনের ক্ষেত্র হয়তো হয়ে ওঠেনি পৌষমেলা -- কিন্তু ৭ই পৌষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আশ্রমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পৌষমেলায় সমাগত মানুষ যে আনন্দের শরীক হয় তা এককথায় অপূর্ব। মেলার বাউল-ফকির-দরবেশের গান, বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি, হাতের কাজের প্রদর্শনী এবং সব কিছুর মধ্যেই নান্দনিকবোধের প্রকাশ -- প্রাত্যহিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ কুণ্ঠিত মনকে মুক্তি দিয়ে আনন্দময় করে তোলে।

পণ্যসামগ্রী কেনাবেচার কোলাহলের ঊর্ধ্বে এই অভূত পূর্ব আনন্দানুভূতি পৌষমেলায় পরমপ্রাপ্তি।

তথ্যসহায়তা:

১। আত্মজীবনী: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। শান্তিনিকেতন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। রবীন্দ্রজীবনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com